নারীর পণ্যায়ন, পুরুষতন্ত্র ও ধর্ষণ

চিররঞ্জন সরকার

এখনো পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন কোনো জায়গা/জনপদ/রাষ্ট্র খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে নারী নিরাপদ; তা সে/তিনি শিশু, কিশোরী, তরুণী, মধ্যবয়স্কা, বৃদ্ধা যাই হোন না কেন। যেখানে নারীকে মানুষের মর্যাদা দেওয়া হয়; যেখানে জীবনের প্রথম ভাগে পিতার, দ্বিতীয় ভাগে পতির এবং শেষ ভাগে পুত্রের নাম অভিভাবক হিসেবে চর্চা কিংবা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না; যেখানে প্রতিটি নারী নিজেই নিজের অভিভাবক— এমন কোনো স্থান দুনিয়ায় আছে কি?

জন্মগ্রহণের পর থেকে একটি শিশুকে পদে পদে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শেখানো হয়— টিভি-ফ্রিজ-ওয়াশিং মেশিনের মতো তুমিও একটা লাভজনক সামগ্রী! এসব জিনিসের যেমন সার্ভিসিং-এর প্রয়োজন পড়ে, ঠিক তেমনি তোমারও সার্ভিসিং-এর দরকার হয়, নইলে যে মূল্য যোগ হবে না। তখন যে কেউ তোমাকে ভোগ বা কনজ্যুম করবে না! আর এটা কে না জানে, যে-পণ্যের ভোক্তা নেই, সেই পণ্যের অস্তিত্বও নেই। এই আকর্ষণ বাড়ানোর প্রতিযোগিতা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের চর্চায় এবং নাটক-সিনেমা-টিভিতে দেখে দেখে সেই ছোট্ট মেয়েটিও ধীরে ধীরে তার 'জীবনের লক্ষ্য' অনুধাবন করতে পারে। পারিপার্শ্বিকতা তাকে বুঝিয়ে ছাড়ে 'দেহই সত্য, দেহই ধর্ম, দেহই সাধনা'। চিন্তা-ভাবনা-চেতনা-যুক্তি-বিবেচনাবোধ-মানবিকতাবোধ— এসবের কোনো মূল্য নেই, কাজেই এগুলো পণ্যও না। পুঁজিবাদী লেনদেনের বাজারে এদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবশ্য একদম নিষিদ্ধ তা নয়। মুনাফার স্বার্থে, পণ্যের চাহিদা বাড়ানোর জন্য, ভোক্তা তৈরির জন্য মানবতার জয়গান নিচু স্কেলে এই সিস্টেমকে গাইতে হয় বৈকি!

মেয়েদের শেখানো হয়, লাইফ এখন অনেক ফাস্ট! সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, নইলে পেছনে পড়ে যাবে তুমি! পুঁজিবাদী সিস্টেমে যেখানে নারীর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ, এমনকি যৌনাঙ্গ পর্যন্ত ভোক্তা-পণ্য তালিকায় বেশ লাভজনক পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়, সেই ব্যবস্থা তখন তাদের বাধ্য করে খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে, ফিগার সচেতন হতে, বিউটি পার্লার-জিমে নিয়মিত যেতে। ব্যায়াম করে যে যত বেশি 'গলার হাড্ডি' স্পষ্ট করতে পারবে, সে তত বেশি আকর্ষণীয় বিবেচিত হবে। তাকে সবাই 'সেক্সি' অভিধা দেবে। আর ওজন বেড়ে গেলে তো কথাই নেই! অনবরত তাকে শুনতে হবে 'ধুমসি হয়ে গেছো!', 'আস্ত একটা হাতি!', 'এত মোটা হয়েছ, চিনতেই পারি নি!', 'আগের সেই আবেদন আর নাই', ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ব্যবস্থা তাকে নিয়ে কেনা-বেচা ততক্ষণ পর্যন্তই করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে 'যুবতী', যৌন আবেদনময়ী। এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে ব্যর্থ হলে সে অনাদরে পড়ে থাকবে।

পুরো বিশ্বে নারীরা এখন ভোগবাদী ব্যবস্থার কারণে ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিকভাবে ধর্ষিত হচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে। 'মানুষ' নয়, নারীদের ভোগের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে বিজ্ঞাপন, ফিল্ম, বইপুস্তকসহ আরো নানা জায়গায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। দাসত্বের মানসিকতা সফলভাবে তাদের মননে-চিন্তায়-চেতনায় রোপণ করা হচ্ছে। দাসযুগে দাসেরা জানত তারা কী। শেকলের ঝনৎকার ও টান তারা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতির যুগে বা ভোগবাদী ব্যবস্থায় নারী বুঝতেই পারে না যে তারা 'দাস' হিসেবে বেঁচে রয়েছে। পায়ে বাঁধা শেকলের অস্তিত্ব তারা টের পায় না। নারীরা যে আর দশটা পণ্যের মতোই বিক্রয়যোগ্য, তারা তা ধরতেই পারে না। এভাবে চলতে চলতে লোহার শেকলে বন্দি নারী ক্ষমতাবান পুঁজিপতিদের দ্বারা ব্যাপকহারে উৎপাদিত, কর্তৃত্ববাদী মানসিকতাকে একসময় নিজের বলে মনে করতে শুরু করে। দাস হয়েও প্রভুর চোখ দিয়ে তারা দুনিয়া দেখে, প্রভুর অপমান মানে তার অপমান, প্রভুর আদর্শ হয়ে যায় তার নিজের মতাদর্শ, প্রভুর ওপর আঘাত মানে তার ওপর আঘাত। তাই সে সর্বদা পাহারা দেয় প্রভুর মতাদর্শ। কোনোরকম আঘাত সে বরদাস্ত করে না, কোনোরকম আপোশ সে করে না। আজীবন সে প্রভুকে সমর্থন করতে থাকে।

'৩৬-২৫-৩৬' দেহের স্মার্ট, তুখোড় 'ইংরেজি বলিয়ে নারী' যে এই 'মডার্ন' পৃথিবীর 'মডার্ন' দাস তা বুঝতে সে অক্ষম। তাকে ভোলানোর সব পন্থা এই ব্যবস্থার জানা। এই ব্যবস্থা আধুনিকতার নামে, ফ্যাশনের নামে নারীকে বানিয়ে ফেলছে ভোগের পুতুল। এর সপক্ষে সাফাই গাওয়ার লোকেরও তাই অভাব হয় না।

পুঁজিবাদী কাঠামোয় বেড়ে ওঠা একটি ছেলে যখন দেখে তার মা-বোনকে, বাবা ও পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যরা কীভাবে দেখছে; যখন সে বন্ধুদের দেখে রাস্তায় মেয়ে দেখলেই শিস দিতে, কুমন্তব্য করতে, 'হাই সেক্সি!,' 'সি ইজ সো কুউ-উ-ল' বলে টিজ করতে, 'জ্বালাইয়া গেলি মনের আগুন, নিভাইয়া গেলি না'র মতো মতলবি গান গাইতে; যখন সে টিভি-সিনেমায় দেখে অশ্লীল নৃত্য করতে; যখন সে এক ক্লিকে পর্নো ভিডিওর জগতে প্রবেশ করার কায়দা রপ্ত করে ফেলে— তখন কীভাবে তার পক্ষে সম্ভব সহপাঠীদের, আত্মীয়াদের, অফিসের নারী সহকর্মীদের, এমনকি জীবনসঙ্গিনীকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা? মেয়েরা তো তার কাছে 'যৌনবস্তু' ছাড়া আর কিছুই না! পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যই তো মেয়েদের জন্ম হয়েছে!

পুরুষের সামনে নারী কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করবে, তার সহজপাঠ রাষ্ট্র বাচ্চাকাল থেকেই তাকে শেখানো শুরু করে। শারীরিক ও মানসিকভাবে ধর্ষিত নারীদের যখন রাষ্ট্র আত্মহত্যা-মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তখনো আমরা এই পরিপাটি ব্যবস্থাটিকে বুঝতে পারি না!

অর্ধেক মানবী তুমি বাকি অর্ধেক কল্পনা

নারী নির্যাতন কেন হয়, ধর্ষণ কেন ঘটে— এসব প্রশ্নের উত্তরে আমাদের চারপাশে অনেক কথা শোনা যায়; যেমন, নারীর প্রোভোকেটিভ পোশাক পরিধান (পাঁচ বছরের শিশুর শরীর কীভাবে কাউকে প্রোভোক করে?), ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় (ধর্মতান্ত্রিক মধ্যপ্রাচের দেশগুলোতে ধর্ষণের হার তবে এত বেশি কেন? এত কম কেন ধর্মনিরপেক্ষ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে?), পুরুষের যৌন কামনা (তবে স্বমেহনের বদলে ধর্ষণ কেন?), ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসবই আসলে পুরুষতান্ত্রিক স্থূলযুক্তি। নারীবাদীরা এসব যুক্তিকে গ্রাহ্য করেন না। তাদের মতে, বর্তমান বিশ্বে ধর্ষণের আদি কারণ সুপ্রাচীনকাল থেকে মানবসমাজে বহমান পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা, ক্ষমতা, আধিপত্য আর কর্তৃত্ব স্থাপনের মানসিকতা, যাকে ব্যাপকভাবে টিকিয়ে রেখেছে স্বীয় স্বার্থে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ভোগবাদী সংস্কৃতি।

খবরের কাগজ থেকে টেলিভিশনের পর্দা, পাঠ্যপুস্তক থেকে বিলবোর্ড সর্বত্র নারীর পণ্যায়ন ঘটছে খুব স্বাভাবিকভাবে। নারীশরীরের প্রদর্শন পণ্য বিক্রির জন্য সুবিধাজনক, তাই সারা দুনিয়ার বিপণন-বিশেষজ্ঞরা শেভিং ক্রিমের বিজ্ঞাপনেও নারীশরীরের নিরর্থক প্রদর্শনীতে পিছপা হচ্ছেন না। শিল্প-সাহিত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা-নাটক-সিনেমাসহ সব জায়গায় নারীকে উপস্থাপন করা হচ্ছে বা দেখানো হচ্ছে বস্তু হিসেবে। এভাবেই ঘটছে নারীর বস্তুকরণ। নারী নিজেও যে এইসব অপকাণ্ডের প্রভাবমুক্ত নন সম্পূর্ণভাবে, এর প্রমাণ পাওয়া যায় সম্প্রতি জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেত্রী কারিনা কাপুরের একটি মন্তব্যে। ওই মন্তব্যে তিনি দাবি করেছেন, 'আবেদনময়ী' হওয়াই নারীজীবনের সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা!

পুঁজিবাদী বিশ্বের ভোগবাদী সংস্কৃতি এবং নারীকে পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে সূক্ষ্ম কারসাজি তার ফাঁদে পড়েছে নারীরাও। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা, সুপারহিট হলিউড মুভি, নামী-দামী ফ্যাশন ম্যাগাজিন কিংবা চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপনের সাহায্যে তারা আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করছে নারীদের। বর্তমানে নারীর শরীরের ওজন, প্রতিটি অঙ্গের মাপ, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সাজসজ্জা পর্যন্ত সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় ফ্যাশন, ডায়েট কিংবা কসমেটিকস ইন্ডাস্ট্রিজের দ্বারা। করপোরেট-সমাজের নির্দেশ মানতে গিয়ে তারা নিজেকে পরিণত করে সস্তা বিনোদনের পাত্রে। পুঁজিবাদী সমাজ নারীকে দেখে নিরেট ভোগ্যপণ্য ও মুনাফা হাসিলের উপকরণ হিসেবে। ফলে, নারী সমাজের কোনো সম্মানিত সদস্য হিসেবে বিবেচিত না হয়ে সমাজে প্রচলিত অন্যান্য পণ্যের মতোই পরিণত হয় বিকিকিনির পণ্যে। আর হীন স্বার্থসিদ্ধির মোহে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী নারীর তথাকথিত দৈহিক সৌন্দর্যকে পুঁজি করে চালায় জমজমাট ব্যবসা। নারীদেহকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে ফ্যাশন ও পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রিজ। গণমাধ্যমগুলোতে নারীকে প্রতিনিয়ত 'সেক্স সিম্বল' হিসেবে উপস্থাপন করার ফলে নারীর প্রতি সমাজের সর্বস্তরে তৈরি হয় অসম্মানজনক এক বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি। আর বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল হিসেবে শিক্ষিত নারীরাও কর্মক্ষেত্রে তাদের পুরুষ সহকর্মীর কাছে প্রতিনিয়ত হয় যৌন হয়রানির শিকার।

বলিউড, ঢালিউড বা হলিউডের অধিকাংশ সিনেমা এবং বিনোদন মিডিয়ায় যে নায়িকা, গায়িকা, নাচিয়ে নারীকে দেখানো হয়, তার প্রধান আকর্ষণ যৌনাবেদন। বিলবোর্ড ও বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত নারীরাও তা-ই। রিয়েলিটি শো-এর নামে বালিকা-কিশোরীদেরও এমন নাচ-গান-অঙ্গভঙ্গি ও পোশাকে অভ্যস্ত করা হচ্ছে, যাতে তাদেরও ওইসব 'ইচ্ছুক' পূর্ণবয়স্ক নারীর মতো লাগে। তারা যেন সব সময়ই প্রেমের জন্য, পুরুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য অধীর হয়ে থাকে। এভাবে পুরুষালি দৃশ্যমাধ্যমে যে 'ইচ্ছুক নারী'র ভাবমূর্তি সাজানো হয়, সেটাই বাস্তবের নারীর ভাবমূর্তিকে ঢেকে ফেলে। আত্মমর্যাদাবান স্বাধীন নারীর বদলে পুরুষের প্রতি 'ইচ্ছুক নারী'র এই ভাব থেকে পুরুষ-তরুণদের অনেকের মনেও 'ইচ্ছুক নারী'কে ঘনিষ্ঠভাবে পেতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছাটা কিন্তু নারীর নয়, পুরুষতান্ত্রিক যৌনসর্বস্বতাবাদী মিডিয়ার ইচ্ছা, নারীরা যার শিকার।

আমরা কিন্তু নানাদিক থেকে এখনো বেশ রক্ষণশীল, বর্ণবৈষম্যবাদীও বটে। আজও অনেক মেয়ে এবং ছেলে ফর্সা হওয়ার ক্রিম কিনে যাচ্ছে। এখনো বহুমানুষ কোনো আদিবাসী ব্যক্তিকে চমৎকার বাংলা বলতে শুনে 'চমৎকৃত' হন ও মন্তব্য করেন— আপনাকে তো একদম বাঙালি মনে হয়। বোঝাই যায় না আপনি গারো/চাকমা/মারমা! মেয়েটি কালো হলেও সুন্দর। এখনো মেয়ে অন্য ধর্মে প্রেম করলে তাকে আমরা ত্যাজ্য করি। কখনো-বা পুড়িয়ে বা পিটিয়ে মারি; যা কি না সম্মানরক্ষার্থে হত্যা! আর আমাদের সর্বগ্রাসী যৌনতার উপসর্গ তো আছেই।

ভোগবাদী সমাজে যৌনতা সব সময়ই এক ধরনের বাহ্যিক উত্তেজনার আবহ তৈরি করে। বিলবোর্ড থেকে শুরু করে গল্প-কবিতা-সাহিত্যে, সিনেমা-নাটক-বিজ্ঞাপনে অবাধ যৌনতার বিশাল সমারোহ।

পশ্চিমা সংস্কৃতির বিকৃত ধারণা নিয়ে আমরা নিজেদের খ্যাতিমান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলি। আমরা পর্নোগ্রাফি দেখি, দেখি আর নিজেদের সেখানে কল্পনা করি, যেখানে মেয়ে মানেই হচ্ছে যৌনবস্তু। নাটক সিনেমা বিজ্ঞাপন আমাদের প্রতিনিয়ত শেখায়, নারী হলো 'ভোগ্যপণ্য'। আমরা দেখি শরীরসর্বস্ব মডেল-নায়িকাদের। বিএমডব্লিউয়ের বিজ্ঞাপন দেখে আমরা আবিষ্কার করি মেয়েরা হলো 'বিপণনযোগ্য পণ্য'। আমরা যখন হলিউড-বলিউডের সিনেমাগুলো কিংবা ফ্যাশন চ্যানেলগুলো দেখি, তখন আমাদের মন অজান্তেই বুঝে ফেলে, মেয়ে মানেই শরীর, সেক্স আর সেক্স। পপ গানের জঘন্য মিউজিক ভিডিওগুলোতে শরীরের ঢলাঢলি দেখে আমরা জানতে পারি, নারী হলো 'সেক্স সিম্বল'।

এভাবে আমরা পর্দা থেকে মুখ ফিরিয়ে যখন বাস্তবের মেয়েদের দেখি, তখনো আমাদের মনে থেকে যায় সেই বিভ্রম— নারী মানেই ভোগের বস্তু।

আমাদের পত্রিকাগুলো চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করে দেয়, ঠিক কতটুকু চিপা জিন্স হলে একটা মেয়েকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় (অলিখিতিভাবে যৌনাবেদনময়ী) দেখাবে। রূপচর্চা এখন প্রতিটি পত্রিকার নিয়মিত উপাদান। বিউটি পার্লার সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। পার্লারে নিয়মিত না গেলে মেয়েদের এখন নাকি স্ট্যাটাস থাকে না। পত্রিকা পড়ে তরুণরা জানতে পারে বড়ো মডেল কিংবা অভিনেত্রী হওয়ার জন্য ফটোগ্রাফার কিংবা প্রোডিউসারের কাছে নিজের চরিত্র বিকিয়ে দেওয়া দোষের কিছু না। তারা হিন্দি সিরিয়াল দেখে আবিষ্কার করে নিজেকে সাজিয়ে রাখা হলো স্মার্ট মেয়েদের কাজ!

এটাকে মোটামুটি 'চিরন্তন সত্য'-এ পরিণত করা হয়েছে যে, স্বভাবগতভাবে নারীরা সৌন্দর্য সচেতন, আর পুরুষেরা নারীর এই সৌন্দর্যের প্রতি দুর্বল। এই আরোপিত ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠা দিতে গড়ে উঠেছে পণ্য বাজারজাতকরণের পলিসি। এজন্য শুরু হয়েছে নারীদের আরো কত যৌন আবেদনময়ী করা যায়, তার বিকৃত ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা। শুরুতে এই মানসিকতাকে ছি ছি করলেও এখন প্রগতিবাদীরাও এটিকেই সামাজিক 'ভ্যালু' হিসেবে মেনে নিয়েছে। সেই সঙ্গে সামাজিক যে সমস্ত ভ্যালু মেয়েদের 'মডেস্টি'কে প্রোমোট করত, সেগুলোকে নারী স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতারূপে মিডিয়াতে এমনভাবে সুকৌশলে উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, নারীরা নিজে থেকেই লোলুপ পুরুষদের সংজ্ঞায়িত 'মুক্তি'র স্বাদ পেতে ও 'প্রগতিশীল' হতে গিয়ে পুরানো সব মূল্যবোধকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছে। ফলে নারীরা নিজেদের আরো কত যৌনাবেদনময়ীরূপে উপস্থাপন করা যায়, চেতন বা অবচেতনভাবে সে প্রচেষ্টায় বিভোর থাকে। চেয়ার-টেবিল ও ক্রিকেট খেলা থেকে শুরু করে এমনকি কল মেরামত করার বিজ্ঞাপনেও যোগসূত্রহীনভাবে নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর দেহকে প্রদর্শন করে প্রোডাক্টটি অন্তরে গেঁথে দেওয়া। এভাবে নারীকে বস্তু বা পণ্যের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে যেসব বাণিজ্যিক সিনেমা তৈরি করা হয়, সেগুলোতে যত না কাহিনিনির্ভরতা দেওয়া হয়, তার চেয়ে বেশি বরং যৌনাবেদনকে ফোকাস করা হয়। এতে তরুণরা 'সেক্সুয়ালি এক্টিভ' বা 'চার্জড' হয়ে থাকে। এর ফলে দেখা যায়, উঠতি বয়সের তরুণরা যৌন হয়রানি থেকে শুরু করে ধর্ষণ ও দলগত ধর্ষণের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধে প্ররোচিত হচ্ছে।

এরকম 'সেক্সুয়ালি স্টিমুলেটেড' সমাজেই গড়ে ওঠে ধর্ষকরা, তাদের প্রধান আকর্ষণ হয় শরীর, তাদের উদ্দেশ্য হয় ভোগ; তাই তাদের সামনে যখন এসে পড়ে কোনো ছাত্রী, পোশাক যাই হোক না কেন, তাদের মাথায় চাড়া দেয় চারপাশ থেকে শিখে আসা নোংরামিগুলো। ধর্ষকদের মনের এই নোংরামি মুহূর্তে সৃষ্টি হয় না, এটা বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ মুহূর্ত ধরে শিখে আসা অনেকগুলো ঘটনা থেকে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল। যে মেয়েটিকে সে সামনে পায়, সে সামান্য নাড়া না দিলেও এটা ঘটে। তাদের চিন্তা নষ্ট হয়েছে বহু আগেই, এই সমাজেরই হাতে। এই সমাজ এভাবে নারী হয়রানির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে।

মার্কিন বিশেষজ্ঞ সুসান গ্রিফিন লিখেছেন, 'আমি কখনোই ধর্ষণের ভয় থেকে মুক্ত ছিলাম না।' এ কথার প্রতিধ্বনি বেশির ভাগ নারীর হৃদয়ে বাজবে। অন্ধকার রাস্তায়, যেকোনো নির্জন স্থান, ভিড়ের মধ্যে, একা বাসায়, এমনকি যেকোনো পরিস্থিতিতে নারীর উদ্বেগের মধ্যে ঢুকে থাকে এক ভয়। এছাড়াও আছে অজস্র 'মিনি রেপ'-এর আশঙ্কা— বাসের মধ্যে পুরুষের অনাকাঙ্ক্ষিত হাত-পা-চোখের নীরব আগ্রাসন। গ্রিফিন লিখেছেন, 'ধর্ষণ হলো সন্ত্রাসেরই এক ধরন, এটা নারীর স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ করে, তাকে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে।' এরপর তিনি যা বলছেন, তা মনে রাখা জরুরি, 'নারীরা তাদের জীবন কাটায় ধর্ষণ সময়সূচির মধ্যে।' অর্থাৎ তাকে কোনো না কোনো প্রকারের যৌন নিপীড়নের হুমকি এড়িয়ে চলতে হয়। আমরা যত দিন না মানব, এই ভয়ের জনক বিদ্যমান সমাজ-সংস্কৃতি ও ব্যবস্থা, তত দিন নারী বা পুরুষ কেউই এই সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হতে পারবে না। পরস্পরের এই মুক্তি ছাড়া নারী-পুরুষে মানবিক ভালোবাসার সম্পর্ক রূপকথাই হয়ে থাকবে।

যৌনযন্ত্র নির্মাণের সংস্কৃতি

যৌনতা আমাদের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই স্বাভাবিক আচরণটাই যখন বিকৃত রূপ নেয়, তখনই সমাজে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের মতো অপরাধগুলো জন্ম নেয়। কিন্তু, এই মানসিক বিকৃতির কারণগুলো প্রেক্ষিত অনুযায়ী তৈরি হয়। এর মূলে রয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, আর সেই সঙ্গে যৌনতা সম্পর্কে অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি।

এদিকে বিজ্ঞাপন-সিনেমায় দেখানো হচ্ছে নারী যৌনবস্তু, টেলিভিশন ও খবরের কাগজেও একই বার্তা। সবখানে মেয়েরা কেবল শরীর, নিভাঁজ নিটোল ত্বক, কেবল স্তন, কেবল যোনি; নারী প্রধানমন্ত্রী হলেও প্রধানমন্ত্রী নয়, দার্শনিক হলেও দার্শনিক নয়, বুদ্ধিজীবী হলেও বুদ্ধিজীবী নয়। তারা কেবল নারী। কেবল শরীর। নারীর শরীরকে ভোগ করবার, ধর্ষণ করবার জন্য এক ধরনের উস্কানি সবখানে থাকে।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা নারীকে একটি যৌনযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করাকে প্রশ্রয় দেয়। যেন পুরুষদের হাতে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যই নারীর জন্ম। এর প্রমাণ আমরা সর্বত্রই পাব। কারণ, মান্ধাতার আমলের 'নিয়মকানুন'ও এসবকে সাহায্য করে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে 'শালীন' পোশাক পরতে হবে, 'জিনস পরা যাবে না— এ ফতোয়া আমাদের অতি পরিচিত। এইভাবে নারীকে 'যন্ত্র' বানানোর প্রচ্ছন্ন মদত তো বহুদিন ধরেই চলছে। বিপরীত লিঙ্গের কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যারা কাউকে 'যৌনযন্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে মনুষত্বের ছিটেফোঁটাও কি থাকে? থাকে না। কিন্তু, তাদের এই মনুষত্ব হারানোর কারণটা কী? কারণ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, বিদ্যমান বিধিব্যবস্থা এবং নিশ্চিতভাবেই পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ আপন বক্ষে লালনপালন করে এই ধর্ষকদের। বিপাকে পড়লে দু'-চারটেকে শাস্তিও দেয়। কিন্তু, চিরতরে এই অপরাধ-প্রবণতাকে বন্ধ করার জন্য সামান্য ব্যবস্থাও নেয় না। উলটো, ধর্ষকদের মদদ দেয়। এই ব্যবস্থার দোষেই আজ নাবালকও ধর্ষকে পরিণত হচ্ছে।

প্রচলিত মূল্যবোধ পোশাক ও ধর্ষণ

'নারী-স্বাধীনতা' ব্যাপারটাকেও কেমন যেন মরীচিকা বানিয়ে রাখা হয়েছে। নারীর স্বাভাবিক অধিকারগুলো কেড়ে নিয়ে এক রক্ষণশীল এবং প্রগতিবিরোধী সমাজব্যবস্থা কায়েমের অপচেষ্টা চলছে। রোজ শোনা যাচ্ছে, ধর্মগুরু থেকে রাজনীতিবিদ সবাই সাফ জানাচ্ছে— 'স্বল্প পোশাকই ধর্ষণের কারণ'; কিংবা, 'অত রাতে একা একা গেলে এসব তো হবেই,' 'মেয়েটাও যথেষ্ট দোষী'। এইসব আমরা বিশ্বাসও করি! নারী-পুরুষের

স্বাভাবিক মেলামেশাকেও এরা ধর্ষণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছে। দায় এড়ানোর এই অপচেষ্টার মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা ধোঁয়াশাও তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ ভাবছেন, স্বল্পবসনা হওয়াটা বোধহয় দারুণ 'সাহসিকতা'। না, 'স্বল্পবসনা' হওয়া বা না হওয়া ব্যক্তির অধিকারের মধ্যেই পড়ে। এটা প্রত্যেকের অধিকার। এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়ার মানে সেই অধিকারে থাবা বসানো। এটাই সহজ কথা। 'ভোগবাদ' (এক্ষেত্রে, নারীকে 'ভোগ্যবস্তু' হিসেবে তুলে ধরে)-এর মোহে আকৃষ্ট হয়ে স্বল্পবসনা হলেও সেটা ধর্ষণের কারণ নয়। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, এই যে ভোগবাদ আজ সুযোগ পেয়ে মনে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, সেই ভোগবাদই কিন্তু ধর্ষকদের মনে অপরাধের বীজটা বপন করে (অবাক লাগে, যখন এই ভোগবাদই খোলামেলা পোশাকের জয়গান গেয়ে নিজে ভালো সাজে)। পোশাক কখনোই ধর্ষণের কারণ নয়। যারা ধর্ষণের কারণ হিসেবে পোশাককে চিহ্নিত করে, তারা তাদের ভোগবাদী মানসিকতাকে লুকিয়ে রাখার জন্যই এই কাজটা করে। তাই, পোশাক স্বল্প হলে সেটা হোক স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ। এটা কোনো সাহসিকতার ব্যাপার নয়। মিডিয়াতে তো স্বল্পবসনাদের সাহসী-দৃশ্যের কথা বলা হয়। এটাও অজ্ঞতা। একজন কেমন পোশাক পরবে না-পরবে, এটা তার ব্যক্তিগত অভিরুচি। এর সঙ্গে সাহসের কি সম্পর্ক? পোশাকের স্বাধীনতা সকলের। এই অধিকার যারা ছিনিয়ে নিতে চায়, আদতে তারাই ধর্ষণকে প্রশ্রয় দেয়।

নারীর পোশাক কী হবে, তা কে নির্ধারণ করবে? উদার গণতন্ত্র বলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিনারীর। দুর্ভাগ্যবশত, বিশ্বের বহু সমাজে ও শাসনপ্রণালিতে পুরুষতন্ত্রের প্রাধান্য এতই প্রবল যে, নারীরা নয়, তাদের পরিবার বা সমাজ, প্রায়শ রাষ্ট্রও তাদের হয়ে এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে থাকে। আমাদের সমাজে এক শ্রেণির মানুষ নারীদের পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ স্থির করতে ব্যস্ত। সেই উদ্যোগ সচরাচর নারীর শরীরকে আবৃত রাখবার উদ্যোগ। পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, নারীশরীর আবৃত রাখা চলবে না— এমন বিধানও কিন্তু প্রকারান্তরে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে হিজাব পরা না-পরা নিয়ে এক বিরাট তর্ক বা দ্বন্দ্ব চলছে। অনেক দেশে এ নিয়ে আন্দোলন পর্যন্ত হচ্ছে। এই তর্ক প্রাসঙ্গিক। হিজাব বা অনুরূপ পোশাক যেভাবে প্রচলিত হয়েছে, তার পেছনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার প্রভাব অবশ্যই প্রবল। পুরুষ শাসনের একটি অস্ত্র হিসেবেই একে কাজে লাগানো হয়েছে। যে নারী 'স্বেচ্ছা'য় হিজাব পরতে চাচ্ছেন, তার ইচ্ছা কতখানি যথার্থ স্ব-ইচ্ছা এবং কতখানি সামাজিক অনুশাসনকে আত্মস্থ করবার ফল, তাও অবশ্যই বড়ো প্রশ্ন। কিন্তু সেই বিতর্কের মোকাবিলা সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরেই করা দরকার, নিষেধাজ্ঞা জারি করে নয়। অবশ্যই পোশাকের যৌক্তিকতা বা ব্যবহারিকতার প্রশ্নটি বিচার করতে হবে। ব্যক্তির পছন্দের স্বাধীনতাকেও শিরোধার্য করতে হবে। ধর্ম বা অন্য কোনো অজুহাত দেখিয়ে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

নারীর ওপর দায় চাপানোর সংস্কৃতি

আমাদের সমাজের অতি-রক্ষণশীলতা এবং পারিবারিক সমস্যাকে গোপন রাখার চেষ্টা ধর্ষণকারীদের শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়। শুধু তাই নয়, আমাদের পুরুষশাসিত সমাজের মানসিকতার দরুন অনেক সময়ে ঘটনার জন্য দোষও চাপানো হয় আক্রান্ত নারীর ওপর। কেন রাতে বেরিয়েছিল, কেন এত সাজগোজ, কেন একা গিয়েছিল, ইত্যাদি প্রশ্নই সামনে চলে আসে।

আমরা কোনো মেয়ে ধর্ষিত হলে তার দোষই আগে খুঁজতে লাগি। মেয়েটি কেমন? তার চরিত্র কেমন? কাপড় কেমন পরে? রাত-বিরাতে কেন বেরোবে? এইসব হয়ে যায় আমাদের আসল জানার বিষয়। একটা মেয়ে যদি সমাজকথিত পতিতাও হয়, আর রাত তিনটায়ও বেরোয় ঘর থেকে, তবু আইন তাকে ধর্ষণ করার অধিকার

কাউকে দেয় না। এই সহজ সত্য কবে আমরা স্বীকার করে নেব? আমরা ধর্ষকদের পক্ষে সাফাই খুঁজতে থাকি আর মেয়েটার খুঁত পেলে বড়ো শান্তি পাই! ভাবি, 'যাক, ছেলেটা একলা দায়ী না, তা কেমনে হবে, ছেলেরা কোনো কারণ ছাড়া এমন করতেই পারে না!'

অনেক পুরুষ বলেন, নারীরাই নারী নির্যাতনের জন্য বেশি দায়ী। নারীরাই নারীদের পরাধীন করে রাখার পক্ষে বেশি ভূমিকা পালন করে থাকে। কথায়ও আছে, মেয়েরাই মেয়েদের বড়ো শত্রু। এসব কথা আমরা প্রতিনিয়ত শুনি। এ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর লেখা 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে। 'সুবর্ণলতা'য় শাশুড়ি প্রতি পদে পুত্রবধূর পায়ে বেড়ি পরাতে চায়। এর কারণটাও আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন, 'যে মহিলা চিরকাল পুরুষের সৃষ্টি করা সংস্কারের অধীন সে কি করে বুঝবে যে স্বাধীনতা কি? তাই সুবর্ণলতা শাশুড়ির এহেন আচরণে তার উপর রাগ করতে পারে না বরং করুণা হয়, যে মানুষটা এতটাই মিথ্যা কুসংস্কারের নাগপাশে বন্দি যে এর বাইরে অন্য কিছু ভাবতেও সে ভুলে গেছে।' গল্পের শেষে লেখিকা দেখিয়েছেন, মনের কালো কুঠুরির দরজায় ঘা মেরে মেরেই সুবর্ণলতা অবশেষে তা ভাঙতে সক্ষম হন। আদতে মেয়েরা মেয়েদের শত্রু নয় মোটেই। এটা পুরুষতন্ত্রের খোঁড়া যুক্তি। এটা মেয়েদের হীন করে রাখার, মেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর এবং পুরুষকে সবরকম অপকর্মের দায় থেকে রেহাই দেওয়ার একটা অপকৌশল। ছোটকাল থেকেই মেয়েদের মাথায় হাতুড়ি মেরে মেরে (মগজ ধোলাই) যা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তারা তার বাইরে সহজে বের হতে চায় না বা পারে না। যা চলে আসছে তাই ঠিক বলে মনে হয়। সংস্কার জাল বিস্তার করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। অবশ্য শুধু সংস্কারই বা কেন? সব নিয়ম, সব ধর্ম, সব রীতিনীতির তো একটাই লক্ষ্য— যেনতেনভাবে মেয়েদের স্বাধীনতা খর্ব করা।

ধর্মীয় অনুশাসন, পর্দা ও নারীর নিরাপত্তা

আমাদের দেশের অনেকেই মনে করেন, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে বা নারী যদি পোশাক-আশাক ঠিকমতো পরে, পর্দা ব্যবহার করে, তাহলে উত্ত্যক্তকরণ, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, ইত্যাদি ঘটবে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আরব দেশগুলো, যেখানে নারীরা আপাদমস্তক ঢেকে চলাফেরা করে, সেখানে কি ধর্ষণ হচ্ছে না? সমস্যাটা কি শুধু নারীর বেশভূষায়? প্রতিদিন পৃথিবীতে অজস্র নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হচ্ছে। তার ভেতরে রয়েছে নাবালিকা, রয়েছে মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধা নারীও। আমরা গাইবান্ধার ৮-৯ বছরের শিশু তৃষার কথা জানি, যে যৌন হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করেছিল। আমাদের দেশে তৃষার মতো অসংখ্য শিশু প্রায় প্রতিদিন ধর্ষিত হচ্ছে, যাদের শরীরই-বা কী আর পোশাকই-বা কী!

মেয়েরা ছোট পোশাক পরলে ছেলেরা প্রলুব্ধ হয় ফলে ধর্ষণ বেড়ে যাবে, এরকম হলে তো ছেলেদেরই বেশি ধর্ষিত হবার কথা! ছেলেরা তো মেয়েদের চেয়ে ছোট পোশাক পরে। মেয়েরা ছোট পোশাক পরছে এটা তো খুব বেশিদিনের ঘটনা নয়, তার আগে কি তবে ধর্ষণের ঘটনা ঘটত না? না কি যারা ধর্ষিত হয়, তারা সবাই ছোট পোশাক পরিহিতা? যেসব দেশের নারী পর্দা করে, সেসব দেশের নারীরা কি ধর্ষিত হয় না?

আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র কালজয়ী উপন্যাস 'লালসালু'র মজিদের কথা জানি, যে তার অল্পবয়েসি স্ত্রী জমিলার পা দেখেই কামার্ত হয়ে উঠেছিল। আসলে যার মনে 'পাপ', তাকে কি ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে, পর্দা দিয়ে আটকে রাখা যাবে? যারা জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' পড়েছেন, তারা জানবেন একাত্তরে পাকবাহিনী অনেক বৃদ্ধা নারীকেও ধর্ষণ করেছিল। আবার নিজের মেয়েকে ধর্ষণ করে, এরকম মানুষও

পৃথিবীতে কম নয়। তাহলে কেন শুধু শুধু পোশাকের কথা বলে নারীর ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা? এটা কি পুরুষকে সাধু সাজিয়ে নারীকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর অপচেষ্টা নয়?

খবরের কাগজে প্রায়ই চার বছর, পাঁচ বছর, ছয় বছর, সাত বছর বয়েসি মেয়েদের ধর্ষণের খবর পাঠ করে আমরা আঁতকে উঠি। যারা পর্দার কথা বলেন, নারীর পোশাক ও আচরণের কথা বলেন, তারা কী ব্যাখ্যা দেবেন এসব ঘটনার? এসব শিশুর কি পর্দা করাবেন আপনি? কেউ কি নিশ্চয়তা দিতে পারবে যে ছোট পোশাক না পরলে কোনো মেয়ে ধর্ষিতা হবে না? যখন মেয়েশিশুরা ক্রমাগত ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, তখনো কি আমরা পর্দা ও অশ্লীলতার প্রশ্ন তুলে পুরুষের পাপঢাকার আয়োজনেই মত্ত থাকব? এসব বিষয় আজ বিশেষভাবে ভাববার সময় এসেছে।

'সতীত্ব', ধর্ষণ ও পুরুষতন্ত্র

ধর্ষণ সম্ভবত খুনের চেয়েও নিকৃষ্ট। যদিও ধর্ষণ আর খুন এক ব্যাপার নয়। তবে নানান জনের কাছে নানানভাবে আসে। খুন মানে মানুষটি আর থাকল না। এটা চূড়ান্ত একটা অবস্থা। একটা মানুষকে তার বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো।

ধর্ষণ মানে মানুষটি থাকল, আরো আরো ধর্ষিত হবার জন্য এবং সেটা শুধু শারীরিক নয়, মানসিকভাবেও। এটাই ধর্ষণের সবচেয়ে খারাপ দিক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর শরীরকে 'শুচিতা' এবং 'সতীত্ব' নামক শব্দ দিয়ে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। আসলে সতীত্ব নামে একটা আজগুবি ধারণা পিতৃতন্ত্র আমাদের গিলিয়েছে। সতীত্ব শুধু মেয়েদেরই থাকে। পুরুষের সতীত্বের কিছুতেই কিছু হয় না। সমাজ একদিকে সতীত্বের ধারণাটি শরীরের অধিকারকে একটি বা দুটি অঙ্গের বিষয় বলে ছোট করে দেখায়, অন্যদিকে সতীত্বকে নারীর 'সবকিছু' বলে মানতে শেখায়। তাই ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে বেশির ভাগ নারীই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন। মনে করেন, তাঁর বেঁচে থাকার আর কোনো অর্থ নেই।

ধর্ষণ আসলে একটি পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া, যার উচ্ছেদ চাইতে হলে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে হবে। নিজেদের মানসিকতা পালটাতে হবে সবার আগে।

কেউ জোর করে কোনো নারীর শরীরের ওপর তার অধিকার ক্ষুণ্ন করলে সে অপমানিত হতে পারে, শারীরিকভাবে আহত হতে পারে, কিন্তু তার শরীরের শুচিতা নষ্ট হবে কেন? একজন নারী ধর্ষিত হওয়ার পর ক্রমাগত তার ওপর যে মানসিক নির্যাতন চলে, সেটা সহ্য করা ভীষণ কঠিন, যা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যরা কিছুতেই বুঝতে পারে না। লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতায়নের নিয়ম যতদিন না পালটাবে, মেয়েরা যতদিন না নিজেদের পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে ভাবা বন্ধ করবে, আমাদের ততদিন এই ভয়ংকর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না।

কোনো ধর্ষণ কখনো কোনো মেয়ের দোষে ঘটে না। ধর্ষণকে নিয়ে আমাদের সমাজে পালন করে চলা অদ্ভুত নীরবতা আর অবাস্তব কাল্পনিক মিথকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে না পারলে ধর্ষণের সংস্কৃতি চলতেই থাকবে। মেয়েরা কোনো সহজলভ্য ভোগ্য সামগ্রী নয়। ধর্ষণের মতো অপরাধ একজন মেয়েকে মানুষ হিসেবে সামাজিক ও মানসিকভাবে সবচেয়ে একা করে দেয়।

আমাদের সমাজে পিতৃতন্ত্র পুরুষের পক্ষে যে সমাজ-সংস্কৃতি-নিয়মনীতি তৈরি করেছে, তা একটা বৈষম্যময় সমাজ টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করছে। পিতৃতন্ত্র আমাদের জীবন সম্পর্কে একটা ছক এঁকে দিয়েছে। এটাকে আমরা বলি সামাজিক নিয়ম। পিতৃতন্ত্র সব মানুষের সব অধিকারকে সব সময় স্বীকৃতি

দিতে অপারগ। পরিবার, সমাজ, নিয়ম, রীতিনীতি, ধর্ম, রাষ্ট্র— এগুলো পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণা। পিতৃতন্ত্রকে পোক্ত করতে এবং বিকশিত করতেই এসবের সৃষ্টি এবং অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নিয়ম, প্রথা, ধর্ম এবং স্থানকালপাত্রপ্রেক্ষিত বিবেচনায় নিয়ে মানা না-মানার প্রশ্নটি আসে। আমাদের এই উপলব্ধিতে পৌঁছাতে হবে যে, আমরা কি প্রশ্ন করে এগোবো, না যা চলছে, যেভাবে চলছে তাকেই মেনে নেব? মনে রাখতে হবে, বৈষম্যের ধারণা থেকেই পিতৃতন্ত্র বা জেন্ডারসংক্রান্ত আলোচনা সামনে চলে আসে।

মনে রাখা দরকার যে, মানুষের দুটি সত্তা— একটি জৈবিক সত্তা ও অন্যটি সামাজিক সত্তা। জৈবিক বৈসাদৃশ্য স্বাভাবিক, কিন্তু সামাজিক বৈসাদৃশ্য অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয়। যতই শারীরিক তফাত থাক, সামাজিক জীব হিসেবে সকলের একই মূল্য। তার জন্য প্রকৃতি বা বিজ্ঞান কাউকে অস্বীকার করার দরকার নেই। সামাজিক জীব হিসেবে সকলের এক অধিকার, এক কর্মযোগ্যতা। যদি জানা যায়, কোনো কোনো দক্ষতায় একে অপরের থেকে আলাদা, তা মেনে নিয়েও অধিকার ও ক্ষমতার সমতল রচনা করা যায়। কারও অধিকারে কোনোরকম বাধা সৃষ্টি না করেই সেই সমতলে পৌঁছানো সম্ভব।

চিররঞ্জন সরকার সিনিয়র কমিউনিকেশন অফিসার, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি, ব্র্যাক। chiroranjan@gmail.com

সহায়ক গ্রন্থ

১. যৌনতা ও সংস্কৃতি, সুধীর চক্রবর্তী, নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫
২. নয়াদিল্লির ঘটনা ও রক্ষণশীলতার সংস্কৃতি, হামিদা হোসেন, ৩০ ডিসেম্বর, ২০১২, বিডি নিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম
৩. Against Our Will: Men, Women and Rape, Susan Brownmiller, Ballantine, 1975
৪. A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion. Thornhill, Randy; Palmer, Craig T, MIT Press, Cambridge, 2000.